দৈনিক ইত্তেফাক
07 JAN 2006

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা : প্রসঙ্গ কথা

সকলের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নূতন করিয়া উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হইয়াছে। নয়া নীতিমালার ভিতরে কি আছে না আছে, সে সম্পর্কে বিশদ জানা না গেলেও বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিলো নব্বই দশকের মাঝামাঝি। এই নামে একটি অধিদফতরও খোলা হইয়াছিল। শ্রমজীবী শিশু-কিশোর হইতে শুরু করিয়া শিক্ষাবঞ্চিত বয়স্কদের প্রথাগত স্কুলের বাহিরে লেখাপড়া শিখাইবার যে ব্যবস্থা-উহাই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এই কর্মসূচীর অধীনে সাত-আট বছর ধরিয়া বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলিয়াছে বিবিধ প্রকল্পে। প্রায়শই তখন পত্রিকার পাতায় দেখা যাইত যে অমুক জেলা নিরক্ষরতা মুক্ত হইয়াছে। এই রকমভাবে অনেকগুলি জেলা আনুষ্ঠানিকভাবে নিরক্ষরতা মুক্ত হইয়াছিল উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর কল্যাণে। এহেন 'সাফল্যজনক' কাজের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল ছোট-বড় অসংখ্য এনজিও। সফলতার মাত্রা এতখানিই উপরে উঠিয়া গিয়াছিল যে, দেশে শিক্ষিতের হার ৬২ শতাংশ বলিয়া পরিসংখ্যান প্রকাশ করিতেও কর্তৃপক্ষ দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু অচিরাৎ দেখা গেল যে, হিসাবটি সঠিক নয়। বেসরকারী জরিপে প্রকাশ পাইল যে, প্রকৃতপক্ষে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৪২ ভাগ। নিরক্ষরতা মুক্ত জেলা বা অঞ্চলগুলিও যে আসলে তাহা নয়, সে কথাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয় নাই। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে যথেচ্ছাচারের অভিযোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে অধিদফতরটি তুলিয়া দেওয়া হয় অথবা প্রকল্পের মেয়াদ আর বাড়ান হয় নাই। তবে, নাম পরিবর্তন এবং কিছুটা কাটছাঁট করিয়া উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চালু করা হয়। বলাবাহুল্য, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের টাকা আসিয়া থাকে দাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে। কাজেই তাহাদের ডিজাইন অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হইবে-এইতো স্বাভাবিক।

জাতিসংঘ যে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল নির্ধারণ করিয়াছে, তাহাতেও শিক্ষা বিস্তারের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, আমাদের দেশে শিক্ষা প্রসার এবং গণশিক্ষার নামে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সুশৃংখল এবং সঠিক লক্ষ্যগামী বলিবার সুযোগ নাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তারের নামে গত চৌদ্দ-পনের বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১৯ খানা প্রজেক্ট গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব প্রকল্পের পিছনে ব্যয় হইয়াছে ১৯ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা। এইসব প্রকল্পের নাম বিবরণ লিখিতে গেলে বিরাট একখানা বই হইয়া যাইবে। আছে বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাইমারী, আছে কমিউনিটি প্রাইমারী। সেটেলাইট প্রাইমারী স্কুলের কথাও শোনা গিয়াছিল। সেই প্রকল্প কতখানি বাস্তবায়িত হইয়াছে, তাহা জানা কঠিন। সাক্ষরতা বিস্তারের জন্যও ছিল নানা কর্মসূচী। এতকিছুর পর ফলাফল যাহা, তাহা এই যে, দেশে নিরক্ষর জনসংখ্যা এখনও সাক্ষরের অনুপাতে অনেক বেশী। পড়িয়া বুঝিতে পারে এবং লিখিতে সক্ষম এমন সাক্ষরের হিসাব করিলে শিক্ষিতের হার ৪২ শতাংশেরও কম হইবে বলিয়া মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞমহলের অনেকেই। অন্যদিকে এখনও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্কুল গমনোপযোগী সন্তানদের এক বিরাট অংশ রহিয়া যাইতেছে স্কুলের বাহিরে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অনেক গ্রামও আছে, যেখানে কোনো স্কুল পর্যন্ত নাই। গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ এখন সামান্য মাসোহারা ভাতা পাইয়া থাকেন। কেবল এই ভাতা পাইবার জন্য অনেক অভিভাবক সন্তানদের স্কুলের খাতায় নাম উঠায়। কিন্তু এদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো মনোযোগ নাই। প্রাইমারী স্কুলের পরিবেশও এমন আনন্দময় এবং আকর্ষণীয় নয় যে, দিনমান ঘুরিয়া বেড়াইতে অভ্যস্ত ছেলে-মেয়েরাও স্কুলে যাইতে উৎসাহিত বোধ করিবে।

মোটকথা আড়ম্বরপূর্ণ কিতাবি কর্মসূচীর অজস্রতা থাকিলেও অর্জন নগণ্য। ইহার প্রধান কারণ অপচয় এবং বিক্ষিপ্ততা তথা সমন্বয়হীনতা। গণসাক্ষরতার লক্ষ্যে উপ-আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ অবসর সময়ে শিক্ষাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরী এবং নারী-পুরুষদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রাসঙ্গিকতা আছে কি কই। তবে, [illegible] প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নিরস বৈচিত্র্যের অবসান ঘটাইয়া দেশব্যাপী একটি গতিশীল এবং সুসমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষা পরিকাঠামো গড়িয়া তোলা। প্রজেক্ট প্রকল্পের নামে অপচয়ের পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো কিভাবে শক্তিশালী ও সর্ববিস্তারি করা যায়, সেইদিকে মনোযোগ দেওয়া অধিক প্রয়োজন। অপচয় রোধ করিতে পারিলে নিদেনপক্ষে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে জাতীয়করণ করা হয়তো অসম্ভব নয়। নানা ধরনের প্রাইমারী স্কুলের পরিবর্তে একই রকম স্কুল চালু করা বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলের পরিবেশ হইতে হইবে আনন্দময়। শিক্ষকদেরও হইতে হইবে আদর্শ এবং দক্ষতাসম্পন্ন। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।